# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 36 | No. 1 | 1992



Check for updates


## ডায়গ্লসিয়া ও বাংলা ভাষা


| | |
|---|---|
| Volume | 36 |
| Issue | 1 |
| Year | 1992 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | রাজীব হুমায়ুন |
| Published online | October 1, 1992 |
| DOI | 10.62328/sp.v36i1.4 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.4 |
| Pages | 77-92 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# ডায়গ্লসিয়া ও বাংলা ভাষা

রাজীব হুমায়ুন

'ডায়গ্লসিয়া' (Diglossia) বা 'ডাইগ্লসিক সিচুয়েশন' (Diglossic situation) বলতে মূলত একই ভাষার দ্বি-রীতিক পরিস্থিতিকে বোঝায়। একই সময়কালে যদি কোন একটি ভাষার সর্বজনস্বীকৃত দু'টি ভাষারীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকে, তাহলে সে ভাষায় ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি রয়েছে বলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে দু'টি ভাষারীতিরই যুগপৎ আলাদা ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে[১] এবং পরিবেশ অনুসারে সে দু'টি ভাষারীতি কম বেশী ব্যবহৃত হতে হবে। আরবি, গ্রীক ও তামিল ভাষাসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি রয়েছে। আরবি ভাষায় প্রচলিত দুটি ভাষারীতি যথাক্রমে 'আল ফুস্হা' ও 'আল আমিয়াহ' নামে পরিচিত। গ্রীক ভাষায় দুটি ভাষারীতির নাম যথাক্রমে 'কাথারেভৌসা' ও 'ধিমোতিকি'। তামিল ভাষায় দু'টি ভাষারীতিকে বাংলায় যথাক্রমে 'সাহিত্যিক তামিল' ও 'কথ্য তামিল' বলা যায়। আরবি, গ্রীক অথবা তামিল ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষারীতির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, 'সাহিত্যিক তামিল' ব্যবহৃত হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে; অন্যদিক 'কথ্য তামিল' ব্যবহৃত হয় মূলত প্রতিদিনের কথোপকথনে। 'কথ্য তামিলে' কোন সাহিত্য রচিত হয়না। বাংলা ভাষায় সুদীর্ঘকাল থেকে 'সাধুরীতি' ও 'চলতিরীতি' নামে দু'টি রীতি প্রচলিত। এ'দু'টি ভাষারীতির কোন সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নেই অর্থাৎ কোন্ পরিবেশে 'সাধুরীতি' ব্যবহৃত হবে অথবা কোন্ পরিবেশে 'চলতিরীতি' ব্যবহৃত হবে এরকম সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ বর্তমানে নেই। না থাকলেও, যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে এ'দুটি ভাষারীতি বহুল ব্যবহৃত এবং এদের সাংগঠনিক ভিন্নতাও যথেষ্ট সেহেতু বাংলায় ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি রয়েছে বলে ধরা যায়।

দ্বি-উপভাষা পরিস্থিতিকে কোন কোন পণ্ডিত 'ডায়গ্লসিয়া'র অন্তর্ভুক্ত করতে চান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন একটি ভাষার একটি

উপভাষা 'স্ট্যান্ডার্ড ভাষা' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সরকারি কাজকর্মে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ভিন্ন উপভাষা-ভাষী লোকজনের সঙ্গে কথোপকথনসহ কিছু লৌকিক পরিবেশে এ-ভাষা ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, একই ভাষা-অঞ্চলের অন্যান্য উপভাষা (আঞ্চলিক এ-ভাষা) মূলত পারিবারিক পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। বাগদাদে প্রচলিত 'মুসলিম আরবি' ও 'খ্রিস্টান আরবি'র মধ্যে 'মুসলিম আরবি' স্টান্ডার্ড ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। বাগদাদের খ্রিস্টানগণ নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে 'খ্রিস্টান আরবি' এবং লৌকিক পরিবেশে 'মুসলিম আরবি' ব্যবহার ক'রে থাকেন।[২] আমেরিকার নিগ্রোগণ লৌকিক পরিবেশে 'স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান ইংলিশ' এবং পারিবারিক পরিবেশে 'নিগ্রো-ইংলিশ' ব্যবহার করে থাকেন। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সর্বত্র লৌকিক পরিবেশে 'স্ট্যান্ডার্ড বাংলা' প্রচলিত। পারিবারিক পরিবেশে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ সাধারণত নিজেদের উপভাষা ব্যবহার ক'রে থাকেন।

জোশুয়া ফিশম্যান বিশেষ ধরনের দ্বি-ভাষা পরিস্থিতিকেও ডায়গ্লসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে চান। তাঁর মতে প্যারাগুয়েতে বিশেষ ধরনের ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি রয়েছে। সেখানে স্কুল এবং সরকারি কাজকর্মে স্প্যানিস এবং পারিবারিক পরিবেশে 'গুয়ারানি' ব্যবহৃত হয়।[৩] ফিশম্যান কথিত ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি ভারতের সব রাজ্যেই রয়েছে। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ছাড়াও প্রচলিত রয়েছে সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি অথবা আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি। এই হিসেবে বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে অবশ্যই ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি ছিল। কেননা, সেকালে শিক্ষার মাধ্যম এবং অফিস আদালতের ভাষা ছিল মূলত ইংরেজি। বাংলা ব্যবহৃত হতো মূলত দৈনন্দিন কথোপকথনে ও সাহিত্য রচনায়। প্রাথমিক স্কুল, মুদির দোকান ও আরো কয়েকটি ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যবহৃত হতো। ইংল্যান্ডে ল্যাটিন যখন শিক্ষা ও ধর্মের ভাষা ছিল, তখন ইংরেজি ও ল্যাটিনের মধ্যে ডায়গ্লাসিয়া সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।[৪]

তিন ধরনের ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতির মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ফার্গুসন দ্বি-উপভাষা পরিস্থিতির (স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারাইটি ও আঞ্চলিক ভ্যারাইটি) কথা বললেও শেষ পর্যন্ত একই ভাষার দুটি ভাষারীতির (দ্বিরীতি-পরিস্থিতি) ওপর জোর দিয়েছেন:

> Diglossia is a relatively stable language situation in which in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more

complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any section of the community for ordinary conversation.[৫]

'superposed variety' বলতে ফার্গুসন স্থানীয়ভাবে প্রচলিত প্রাথমিক ভাষার অতিরিক্ত ভাষারীতিকে বুঝিয়েছেন। অন্যত্র তিনি 'superposed variety' কে 'High variety' (H) এবং অন্য ভাষারীতিকে 'Low variety' (L)[৬] বলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে-কোন ব্যক্তির বুলি-ভাণ্ডারে একাধিক ভাষা, উপভাষা অথবা ভাষা-বৈচিত্র্য থাকতে পারে। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তিনি এর যে-কোন একটি ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি 'You' অর্থে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ভাষাভাষী যে-কোন ব্যক্তির বুলি-ভাণ্ডারে রয়েছে 'আপনি', 'তুমি' এবং 'তুই'। স্থান-কাল-পাত্র-অনুসারে এদের যে-কোন একটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির ভাষা-ব্যবহারে বৈচিত্র্য থাকলে ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়না। ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতির জন্য একই ভাষার দু'টি ভাষারীতিকে অবশ্যই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে।

ডায়গ্লসিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক দু'টি ভাষারীতির 'function' তথা ভূমিকা নির্ধারণ। ফার্গুসনের মতে, 'হাই ভ্যারাইটি' ব্যবহৃত হয় মসজিদের খোতবায়, গীর্জার সার্মনে, ব্যক্তিগত চিঠিতে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, সংসদের ভাষণে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়, রেডিও-টিভির সংবাদ পাঠে, পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এবং কবিতা রচনার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে 'লো ভ্যারাইটি' ব্যবহৃত হয় বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদের সাথে কথোপকথনে, লোক-সাহিত্যে, কার্টুনের ক্যাপশনে এবং চাকরবাকর, পরিচারক ও কেরানীদের প্রতি নির্দেশ-প্রদান কালে। স্যাভিল ট্রোইক দু'টি ভাষারীতির পার্থক্য ও ভূমিকা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, হাই ভ্যারাইটির (H) সাহিত্যিক ঐতিহ্য আছে, লো ভ্যারাইটির (L) নেই। ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে শেখে (L) আর বিদ্যালয়ে শেখে (H)। 'H' সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে থাকে। 'H'-এর ব্যাকরণ তুলনামূলকভাবে জটিল এবং সম্প্রসারিত (infleted)। 'H' এবং 'L'-এর শব্দ-ভাণ্ডার মূলত এক। ফার্গুসন অথবা স্যাভিল ট্রোইক-নির্ধারিত ভূমিকা সকল ভাষার (এবং ভাষারীতির) ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

আরবি ভাষায় লিখিত ভাষা বলতে মূলত হাই ভ্যারাইটিকে বোঝালেও উপন্যাস এবং চিঠিপত্র 'আল অসিয়া'তে লিখিত হয়ে থাকে। হাই ভ্যারাইটি মাঝে মাঝে শুধু বক্তৃতায় ব্যবহৃত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাত্যহিক কথোপকথনে কথ্য-আরবি ব্যবহৃত হলেও, ক্লাসিক্যাল উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তাছাড়া, ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি একেক দেশে একেক রকম। সামগ্রিক বিচারে কায়রোর আরবি 'লো ভ্যারাইটি'তে পড়ে। কিন্তু মিশরের সর্বত্র কায়রো-আরবি স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত। সেখানে শুধু 'H' শিখলে হবেনা ; 'L' ও শিখতে হবে। ইরাকের বাগদাদে প্রচলিত 'মুসলিম-আরবি' এবং 'খ্রিস্টান আরবি'-র মধ্যে মুসলিম আরবি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে স্বীকৃত।[৭]

## এক ভাষা দুই রীতিঃ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য

ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতিতে 'হাই ভ্যারাইটি' এবং 'লো ভ্যারাইটি' তথা দু'টি ভাষারীতির মধ্যে ধ্বনি, রূপ, বাক্য এবং শব্দ পর্যায়ে কমবেশী পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ ভাষায় এ-পার্থক্য শব্দ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। গ্রীক ভাষায় রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের উদাহরণ মেলে। আরবি ভাষায় দুটি ভাষারীতির মধ্যে ধ্বনিগত ভিন্নতা রয়েছে। সুইচ-জার্মান ভাষায় দু'টি রীতির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য খুব বেশি।[৮] বাংলায় সাধু ও চলতি রীতির মধ্যে শাব্দিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সুলভ।

## ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

আরবি ভাষায় হাই ভ্যারাইটিতে ব্যবহৃত [q], [θ] ও [ð] এর স্থলে লো ভ্যারাইটিতে যথাক্রমে [?], [t] ও [d] ব্যবহৃত হয়। নিচের উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে।[৯]

| হাই | লো | অর্থ |
|---|---|---|
| q | ? | |
| [a q u i l] | [a?u:l ] | আমি বলি |
| θ | t | |
| [ kaθirah ] | [ kətir ] | অনেক |
| ð | d | |
| [ða:kə] | [ da ] | that. |

## রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

আরবি ভাষায় হাই ভ্যারাইটিতে তিনটি কারক ও বিভক্তি দেখতে পাওয়া যায়, লো ভ্যারাইটিতে কোন কারক ও বিভক্তি নেই। গ্রীক ভাষায় হাই ভ্যা-রাইটি অর্থাৎ কাথারেভৌসায় আছে চারটি কারক, পক্ষান্তরে লো ভ্যারাইটি অর্থাৎ ধিমোতিকিতে আছে তিনটি কারক। ফরাসি ভাষার হাই ভ্যারাইটিতে লিঙ্গ ও বচন থাকলেও লো ভ্যারাইটিতে এদের কোনটিই নেই। বাংলায় সাধু ও চলতি রীতির মধ্যে তাহারা/তারা, গুলি/গুলো ইত্যাকার বৈচিত্র্য রয়েছে (ডায়গ্লসিয়া ও বাংলা অংশ দেখুন)।

## শব্দ বৈচিত্র্য

আরবি ভাষায় 'দেখা' অর্থে হাই ভ্যারাইটিতে ব্যবহৃত হয় [ra?a: ]; পক্ষান্তরে লো ভ্যারাইটিতে ব্যবহৃত হয় [ʃa:f ]।[১০] গ্রীক ভাষায় 'মদ' অর্থে ব্যবহৃত [ inos ] ও [Krasi] দুটি শব্দের মধ্যে প্রথমটি ব্যবহৃত হয় হাই ভ্যারাইটিতে; অন্যদিকে [krasi] ব্যবহৃত হয় লো ভ্যারাইটিতে। রেস্তোরার খাবার মেনুতে লিখিত থাকে [inos]। আহারকারী পরিচারককে ডেকে বলে [ k r a s i ] আনতে।[১১] বাংলায় সাধু ও চলতি রীতির মধ্যে মদ্য/মদ, গৃহ/ঘর এ-রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে (ডায়গ্লসিয়া ও বাংলা অংশ দেখুন)।

## স্ট্যান্ডার্ড, আঞ্চলিক ভাষা ও ডায়গ্লসিয়া পরিস্থিতি

পৃথিবীর অনেক জনপদে পারিবারিক পারিবেশে আঞ্চলিক ভাষা এবং অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তথা লৌকিক পরিবেশে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ব্যবহৃত হয়। এ পরিস্থিতিকে কতিপয় ভাষাবিজ্ঞানী ডায়গ্লসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে চান। বাংলাদেশে অধিকাংশ উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্ট্যান্ডার্ড কথ্য বাংলা এবং পারিবারিক পরিবেশে নিজের নিজের আঞ্চলিক মাতৃভাষা ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি নোয়াখালী ও ঢাকায় পড়ালেখা শেষে যদি কর্মস্থল হিসেবে ঢাকায় অবস্থান করেন, তাহলে তিনি অফিস আদালতের শিক্ষিত সহকর্মী ও ভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলবেন। কিন্তু পরিবারের সদস্য, নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবের সংগে নোয়াখালীর কোন একটি

উপভাষায় কথা বলবেন। এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে।

স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে ব্লম ও গাম্পার্য 'Metaphorical code, Switching'-এর কথা বলেছেন। তাঁরা দেখেছেন, কোন কোন ব্যক্তি অফিস-আদালতে একই-সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড ও আঞ্চলিক উভয় ভাষার ব্যবহার করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ইত্যাদি প্রসঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড ও সহকর্মীর পারিবারিক খোঁজখবর নেয়ার সময় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়।[১২] ডি. এইচ. লরেন্স-এর *লেডী চ্যাটারলীজ লাভার* উপন্যাসের নায়ক মেলর বিষয় ও শ্রোতা অনুসারে বার-বার স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি থেকে শিফ্‌ট করে ডার্বিশায়ার অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করেছে।[১৩] উদাহরণস্বরূপ উপন্যাসের ঐ অংশটি উদ্ধৃত করা হলো:

> 'Look at Jane!' he said 'In all her blossoms! Who'll put blossoms on you next year 'Jinny? Me or some body else?... He dropped his dead. Then he said, in dialect: 'Ay, may be I do, may be I do! Well then, I'll say nowt, an' ha' done wi't. But tha mun dress thysen, an' go back to thy stately homes of England, how beautiful they stand. (পেঙ্গুইন বুকস, পৃ. ২৩৯)

আমেরিকার নিগ্রোগণ পারিবারিক পরিবেশে নিগ্রো-ইংরেজি এবং লৌকিক পরিবেশে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি ব্যবহার করে থাকেন এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের গল্প-নাটক-উপন্যাসে তথা সমগ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একই নাটক অথবা উপন্যাসের শিক্ষিত চরিত্রের সংলাপে থাকে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা অন্যদিকে অশিক্ষিত চরিত্রের সংলাপ রচিত হয় কোন একটি উপভাষায়। তাছাড়া একই উপন্যাস অথবা নাটকে শিক্ষিত চরিত্র অশিক্ষিত চরিত্রের সঙ্গে মাঝে-মাঝে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের কিছু নাটকেও আজকাল ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা-ভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ড ঢাকা-ডাইলেক্ট ব্যবহৃত হচ্ছে।

## স্ট্যান্ডার্ড ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য

পৃথিবীর যে কোন জনপদের স্ট্যান্ডার্ড ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষাসমূহের কম বেশী মিল-অমিল রয়েছে। *লেডী চ্যাটারলীজ লাভার* উপন্যাসের নায়ক মেলর-এর সংলাপে আমরা দেখেছি এ-তফাৎ কত বেশী। স্ট্যান্ডার্ড কথ্য-বাংলার সঙ্গে বাংলার প্রত্যেক উপভাষার প্রচুর মিল-অমিল

রয়েছে। বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

### ধ্বনি পার্থক্য

স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় শুধু [k] ধ্বনি আছে। সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে [k] ছাড়াও আছে [k] জাতীয় [x] ধ্বনি। স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় ফ, ভ, থ, ঝ, ঠ, খ, ঘ, ঢ, ধ ইত্যাদি মহাপ্রাণ ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। সন্দ্বীপের উপভাষায় ফ, ভ, ঝ, ঘ, ঢ, ধ নেই। বাংলাদেশের অনেক উপভাষায় [চ] নেই বললে চলে। [চ] এর বদলে প্রায়শ [স] ব্যবহৃত হয়। সন্দ্বীপ ও নোয়াখালী অঞ্চলের অনেক উপভাষায় শব্দের আদিতে [প] ব্যবহৃত হয়না।

### রূপমূল পার্থক্য

চট্টগ্রামের উপভাষায় হিন্দুদের মধ্যে সম্মানসূচক রূপমূল [-তক] প্রচলিত আছে। যেমন আসুন অর্থে 'আসতক', স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় [-তক] রূপমূল নেই। সন্দ্বীপের বহুবচনসূচক রূপমূল হচ্ছে [গিন], [গুন], [রা], [গো] ইত্যাদি। [-গিন] এবং [-গুন) ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে 'গণনা করা যায় না এবং 'গণনা করা যায়' এমন বস্তুর শেষে। স্ট্যান্ডার্ড কথ্য-বাংলায় বহুবচন-সূচক রূপমূল হচ্ছে [-রা], [-গুলো] [-গণ], [সমূহ] ইত্যাদি।

### বাক্য -পার্থক্য

স্ট্যান্ডার্ড কথ্য-বাংলা এবং বাংলার উপভাষাসমূহের বাক্যের গঠন মূলত এক। চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্ট্যান্ডার্ড কথ্য-বাংলায় না-সূচক সাধারণ বাক্যের গঠন 'আমি খাবনা' চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিম্নরূপ: 'আই ন খাইয়ুম।' অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড কথ্য বাংলায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'না' ব্যবহৃত হয়, সেখানে চট্টগ্রামের উপভাষায় ক্রিয়ার আগে 'ন' ব্যবহৃত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ব্যবহার করে থাকেন, তখন তাদের অধিকাংশই নিজের উপভাষার প্রভাব কাটাতে সক্ষম হন। স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায়শ নিজের উপভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হন।

### ডায়গ্লসিয়া ও বাংলা

ডায়গ্লসিয়ার মূলতত্ত্ব অনুসারে বাংলায় দ্বিরীতিক পরিস্থিতি আছে কি? এ-তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ফার্গুসন নিজে বাংলা ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ

হওয়া সত্ত্বেও তাঁর 'Diglossia' প্রবন্ধে বাংলার প্রসঙ্গ আনেননি। ভাষাবিজ্ঞানী মৃণাল নাথ বলেছেন, 'সাধু ও চলিতের যদি আলোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে দ্বিবাচনে (অর্থাৎ Diglossia-য়) যে 'functional specialisation' এর কথা বলা হয়েছে, সাধু ও চলিতের ক্ষেত্রে তা গরহাজির। ... বাংলায় যদি দ্বিবাচন স্বীকার করি তবে তা মান্যভাযা এবং উপভাষার সঙ্গে হতে পারে—সাধু-চলিতের সঙ্গে নয়। ডিমক মার্কিনী পণ্ডিত, বাংলা ভাষায় তাঁর অজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু যখন কলকাতার পণ্ডিতেরা বলেন বাংলায় দ্বিবাচন আছে তখনি পীড়াদায়ক মনে হয়। হয় দ্বিবাচন বলতে তিনি কিছু বোঝেননি অথবা যেহেতু কোন বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন সে মতে সায় দিতে হবে তেমন কিছু ধরে নিতে হবে।'[১৪] মৃণাল নাথের এ-রকম শক্ত মন্তব্যের পরও আমাদের মনে হয়েছে বাংলায় ডায়গ্লসিয়া আছে এবং 'functional specialisation' ও সহজে প্রমাণ করা যায়। প্রথমে প্রচলিত ধারণা, বীমস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে সাক্ষী মানা যাক।

প্রচলিত ধারণায় বাংলায় সুস্পষ্ট দু'টি রীতি রয়েছে—সাধু রীতি ও চলতি রীতি। 'রীতি' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রশ্নপত্রের শীর্ষভাগে এখনও লিখিত থাকে 'সাধু ও চলিতের মিশ্রণ দূষণীয়', মিশ্রণ ঘটলে 'জগাখিচুড়ী' ও 'গুরুচণ্ডালী' দোষ ঘটেছে বলা হয়, দুটি রীতির ধারণা না থাকলে 'দূষণীয়' 'গুরুচণ্ডালী' দোষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ওঠে কেন? বীম্‌স তাঁর ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে কথ্যরীতি ছাড়াও সংস্কৃত শব্দবহুল দুর্বোধ্য সাহিত্যিক রীতির উল্লেখ করেছিলেন।[১৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালায় লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা ; অপরটির নাম অপরভাষা। একটি লিখিবার ভাষা ; দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।'[১৬] বঙ্কিমচন্দ্র 'অপর ভাষা' বলতে চলতি রীতিকে বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চলতি ও সাধু ভাষা' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতে তাঁর বক্তব্য ছিল এ-রকম:

> রূপকথায় বলে এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধীরূপেরও আছে দুই রানী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা, আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় বলেছি, প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার-করা অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। ... রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয়

দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকানো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধ্যে-বেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায় আর বোষ্টমী এসে গান শুনিয়ে যায় ভোর বেলাতে। গল্পের শেষ অংশটি এখনো সম্পূর্ণ আসেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।[১৭]

সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী *সবুজ পত্র* পত্রিকার মাধ্যমে প্রবল আন্দোলন চালিয়েছিলেন চলতি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। দুটো রীতি না থাকলে আন্দোলন করলেন কি নিয়ে? ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাধু-চলতি রীতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, একদিন চলতি রীতিই প্রাধান্য পাবে, 'যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল।'[১৮] ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা প্রসঙ্গে বলছেন:

সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে। সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্য-লেখায়, চিঠি-পত্রাদিতে প্রায়শঃ এই ভাষা ব্যবহৃত হয়।... দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাংলা দেশের মৌখিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।... এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষভাবে চলিত ভাষা বা চল্‌তি ভাষা বলা হয় ; এবং অধুনা, সাহিত্যের সাধু-ভাষার পার্শ্বে; এই মৌখিক বা চলিত ভাষার আধারের উপরে স্থাপিত আর একটি সাহিত্যিক ভাষা বিশেষ স্থান পাইয়াছে ; সেই নতুন সাহিত্যিক ভাষাকেও চলিত ভাষা বলা হয়।[১৯]

## সাধু ও চলতি রীতি: সাংগঠনিক ভিন্নতা

সাধু ও চলতি রীতির সংগঠনিক ভিন্নতা শব্দ, রূপমূল এবং বাক্যপর্যায়ে অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। বলা প্রয়োজন, এ-দুটি ভাষারীতির ধ্বনি বৈশিষ্ট্য একই রকম।

### শব্দ পর্যায়

| | সাধু | চলতি |
|---|---|---|
| বিশেষ্য শব্দ | জুতা | জুতো |
| | কূয়া | কুয়ো |
| | সূতা | সূতো |

| | সাধু | চলতি |
|---|---|---|
| বিশেষ্য শব্দ | মিথ্যা/ মিছা | মিছে |
| | গৃহ | ঘর |
| | মদ্য | মদ |
| | পূর্ব-বঙ্গ | পূব-বাংলা ইত্যাদি অসংখ্যশব্দ। |
| সর্বনাম | তাহার | তার |
| | তাহাদের | তাদের |
| | ইহাদের | ওদের |
| | উহাকে | ওকে |
| | তাহাকে | তাকে |
| | তাহাদিগকে | তাদের |
| | তাহাতে | তাতে |
| | কাহারা | কারা |
| | ইহারা | এরা |
| | ইহাকে | একে |
| | সবাই | সবে |
| | আপনাদিগকে | আপনাদের |
| | তাহাদিগকে | তাদের |
| | তোমাদিগের | তোমাদের |
| | আমাদিগের | আমাদের ইত্যাদি। |
| ক্রিয়া | করিতেছি | করছি |
| | যাইতেছি | যাচ্ছি |
| | যাইতাম | যেতাম |
| | যাইব | যাব ইত্যাদি |
| বিবিধ শব্দ | তথাপি | তবু |
| | পুরানো | পুরনো |
| | পিছন | পেছন |
| | ভিতর | ভেতর ইত্যাদি |

## রূপমূলগত ভিন্নতা

| | | সাধু | চলতি |
|---|---|---|---|
| বহুবচন সূচক রূপমূল | | -গুলি<br>-দিগের | -গুলো<br>-দের |
| কালসূচক রূপমূল | ঘটমান | -ইতেছে/ ইতেছেন/ ইতেছ/<br>-ইতেছিস/-ইতিছি<br>যেমন,<br>করিতেছে, করিতেছেন,<br>করিতেছে/করিতেছিস/<br>করিতেছ<br>ইত্যাদি শব্দে | -ছে/-ছেন/<br>-ছ/-ছিস/-ছি<br>যেমন, করছে,<br>কবছেন, করছ,<br>করছিস, করছি<br>ইত্যাদি শব্দে। |
| | পুরাঘটিত | -ইয়াছে/-ইয়াছেন/<br>-ইয়াছে/-ইয়াছিস<br>(যেমন,<br>করিয়াছে, করিয়াছেন,<br>করিয়াছ, করিয়াছিস<br>ইত্যাদি শব্দে। | -এছে/-এছেন/<br>-ছ/-ছিস<br>যেমন করেছে,<br>করেছেন, করেছ,<br>করছিস ইত্যাদি শব্দে। |
| | অতীত | -ইল/-ইলেন/-ইলে/<br>-ইলি/-ইলাম (যেমন,<br>করিল, করিলেন, করিলে<br>করিলি, করিলাম ইত্যাদি শব্দে | -রল/-লেন/-লে/-লি<br>যেমন, করল, করলেন,<br>করলে, করলি<br>ইত্যাদি শব্দে। |
| - | ভবিষ্যৎ | -ইব/-ইবেন/-ইবে/-<br>-ইবি/-যেমন,<br>করিব, করিবেন, করিবে<br>করিবি। | -ব/-বেন/-বি যেমন,<br>করব, করবেন,<br>করবে, করবি<br>ইত্যাদি শব্দে |
| না-সূচক রূপমূল | | -নাই<br>যেমন, করেন নাই। | -নি<br>যেমন, করেননি। |

রামেশ্বর শ' অনুসর্গ ও যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারে সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্যের কথা বলেছেন: 'বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গেও সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন সাধুভাষা: দ্বারা, সহিত, সমভিব্যাহারে, হইতে, অভ্যন্তরে ইত্যাদি। চলিতভাষা:দিয়ে, সঙ্গে, থেকে, ভেতরে বা মধ্যে ইত্যাদি; ··· যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার

সাধু ভাষায় বেশী, চলিত ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম। যেমন, সাধুভাষা: গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা, আহার করা ইত্যাদি। চলিত ভাষা: যাওয়া, শোয়া, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি।'[২০]

## বাক্য পর্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে *প্রবাসী* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের এক জায়গায় তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

> এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলে নাক সিটকাইয়া উঠেন, বলেন--"এটা ইতুরে কথা", উহার বদলে তাঁহাড়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটেনা", তাঁহারা বলেন "কাটেনা, ছি!--ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্তন হয়না"। আমরা কথায় বলি "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও"। তাঁহাবা বলেন, "ছিঃ ইতুরে কথা। পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়। তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হয়"। ... এখন ইংরেজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাহাদের সাধুভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।[২১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এ রচনা থেকে সাধু ও চলতি রীতির বাক্যের উদাহরণ এবং সে সাথে সেকালের সাধুভাষার সমর্থকদের মানসিকতা বোঝা যায়।

এবারে সাধুরীতির গদ্যের কটি নমুনা নেয়া যাক:

> 'গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী, উপরে কম্পায়মানা সামপা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হও ত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। (সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫২)।

এ-জাতীয় বাক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অনাবশ্যক দীর্ঘতা, তৎসম বাহুল্য ও সমাসবদ্ধ শব্দের প্রাচুর্য। এককথায় সংস্কৃতের অনুসরণ। বীম্‌স এ-জাতীয় গদ্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন, '... there is reason for fear lest the literary language should become so learned as to be unintelligible to the masses.'[২২]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত উদাহরণ:

> সাধুরীতির বাক্য--এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বলিল (বা কহিল), "পিতঃ, আপনার সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দিওন (বা দিন)", তাহাতে তাহাদিগের পিতা নিজ সম্পত্তি তাহাদিগের (তাহাদের) মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।
>
> চলতি রীতির বাক্য—একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাপকে বললে, "বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাবো, তা আমাকে দিন।"

তাতে তাদের বাপ নিজের বিষয়-আশয় (বা সম্পত্তি) তাদের মধ্যে ভাগ করে (বা বেঁটে) দিলেন।২৩

## সাধু ও চলতি রীতি: ভূমিকা/ function প্রসঙ্গ

বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা গেল সাধু ও চলতি রীতি দুটো আলাদা ভাষা-রীতি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এ-দুটো ভাষারীতি এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জমির দলিলপত্র, দোকানের জমা খরচের হিসাব, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে সাধুরীতিতে লিখিত হচ্ছে। ১৯৯০ সালে লিখিত একটি দলিলের ভাষা নিম্নরূপ:

> কস্য বায়নানামা দলিল পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে যেহেতু আমি অত্র দলিলদাতা নিম্ন তপসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে পিতার ওয়ারীশ সূত্রে মালিক ও ভোগ দখলে বিদ্যমান আছি। বর্তমানে আমার নগদ টাকার একান্ত আবশ্যক হওয়ায় আপনারা গ্রহিতাগণের নিকট হইতে অগ্রীম বায়না বাবৎ ১,০০,০০০/= (একলক্ষ) টাকা দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া ও নিয়া অত্র বায়নানামা দলিল লিখিয়া দিলাম।

এখনো বহু অফিস-আদালতের নোটিশের ভাষা সাধু-বাংলা। পুরোনো আমলের সাহিত্যিকদের প্রবন্ধে, তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, এমনকি কিছু-কিছু পাঠ্য-পুস্তকে এখনো সাধুরীতি দুর্লভ নয়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় পত্রিকা *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ সাধু ও চলতি রীতির সহাবস্থান চলছে দীর্ঘকাল ধরে। যাত্রা ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রায়শ দেখা যায় সাধুরীতির সংলাপ। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এ'দুটি ভাষারীতির 'functional specialisation' আছে কিনা। আরব দেশে মসজিদে 'হাই ভ্যারাইটি' অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে— সেখানে 'লো ভ্যারাইটি' ব্যবহার করা চলবেনা। বাংলায় এ-রকম আছে কি? একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

এটা ঠিক যে জমির দলিলপত্র, দোকানের জমা-খরচের হিসাব যদিও সাধু রীতিতে রচিত হয়ে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে এবং এটাই নিয়ম ; কিন্তু কেউ যদি বর্তমানে এ সব ক্ষেত্রে চলতি-রীতি ব্যবহার করতে চান তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবেনা। সোজা কথায় সাধু অথবা চলতি-রীতিতে যে কেউ যে কোন কিছু লিখতে পারবেন, কোন বিধিনিষেধ তাকে মানতে হবেনা। সাধু রীতিতে লিখলে তিনি প্রাচীনপন্থী বলে চিহ্নিত হবেন, এই যা। এবারে আমাদের প্রশ্ন সাধু অথবা চলতিরীতিতে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন কিছু লিখতে পারবেন কিন্তু সাধু অথবা চলতি রীতিতে তিনি যে-কোন কিছু বলতে পারবেন কি? নিশ্চয়ই না। দৈনন্দিন কথাবার্তায় কেউ সাধুরীতি ব্যবহার করেন না অর্থাৎ সাধু রীতি মুখের ভাষা নয়। অন্যদিকে চলতি রীতি একই সাথে মুখের ভাষা এবং লেখার ভাষা। তাহলে আমরা এই মুহূর্তে সাধু ও চলতি রীতির একটি function নির্ধারণ করতে পারি:

সাধুরীতি=শুদ্ধ লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত
চলতিরীতি = বলা ও লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

বাংলার ডায়গ্লসিয়া-পরিস্থিতি সব সময় এরকম ছিলনা। এক সময় (বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত) সাধুরীতি ছিল সাহিত্যের ভাষা এবং লেখার ভাষা। বীম্‌স এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যথাক্রমে 'Literary language' এবং 'লিখিবার ভাষা'। অন্যদিকে চলতি রীতি ছিল 'কহিবার ভাষা'। বোঝা যাচ্ছে, সে সময় দু'টি রীতির function সুনির্দিষ্ট ছিল। চলতি রীতিতে সেকালে সাহিত্য রচিত হতোনা। সুদীর্ঘকাল অফিস-আদালত, চিঠিপত্র ও পাঠ্য পুস্তকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সাধুরীতি। চলতি-রীতির পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর প্রবল আন্দোলন শুরুর আগে প্যারীচাঁদ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুখের ভাষা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। যেমন, 'ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্যা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয়না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা (সাধুরীতিতে লিখিত) শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থে মধ্যে মধ্যে অপরাবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।'[২৪] বঙ্কিমচন্দ্র নিজের রচনায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্যিক উপন্যাসের বর্ণনা-অংশে সাধুরীতি এবং সংলাপ-অংশে চলতিরীতি ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে:

> অমল কহিল "আর একটা ছোটো খাটো ঝিলের মতো করতে হবে তাতে হাঁস চরবে।"
> চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আর তাতে নীল পদ্ম দেব, আমার অনেকদিন থেকে নীল পদ্ম দেখবার সাধ আছে' (নষ্টনীড়, গল্পগুচ্ছ)

ধীরে ধীরে সকল দ্বিধা-দৈন্য কাটিয়ে চলতি-রীতি কথাসাহিত্য স্থায়ী আসন করে নিল। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'গদ্য লেখায়, চিঠি-পত্রাদিতে প্রায়শঃ এই ভাষা (সাধু) ব্যবহৃত হয়।' 'গদ্যলেখা' বলতে তিনি নিশ্চয়ই প্রবন্ধকে বুঝিয়েছিলেন। আজকাল 'প্রবন্ধ' থেকে সাধুরীতি বিদায় নিয়েছে বলা চলে। সাধুরীতি চিরতরে বাংলা ভাষা থেকে বিদায় নেবে রবীন্দ্রনাথ এ সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। বর্তমানে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সাধু রীতি অচিরেই চিরতরে বিদায় নেবে। ফলে একসময় বাংলায় ডায়গ্লসিয়া-পরিস্থিতি থাকবেনা। কিন্তু মুখের ভাষা একটি হলেও, বাংলার লিখিত রূপ এখনো দু'টি—একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

## হাই ভেরাইটি ও মর্যাদার প্রশ্ন

ফার্গুসনের বিভাজন অনুসারে 'হাই ভ্যারাইটি'র মর্যাদা 'লো ভ্যারাইটি'র চাইতে কিছু বেশী। অধিকাংশ বক্তা H কে উন্নততর ভাষারীতি হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত। পবিত্র কোরআন যেহেতু H-এ রচিত সেহেতু H ভ্যারাইটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। H ভ্যারাইটিতে সাহিত্যিক-ঐতিহ্য গড়ে উঠবার পেছনেও শ্রেষ্ঠত্বের বোধ কাজ করে।

বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলে এক সময়ে সাধুরীতি সুয়োরানীর মতো মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সাধারণ লোকতো বটেই, এমনকি পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, সাধু ভাষা তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুশৃঙ্খল ভাষা। 'ইহার বাক্য-রীতিও কতকটা সুনির্ধারিত। মোটের উপর সাধু ভাষার যে একটি সহজ গাম্ভীর্য, সৌষম্য এবং আভিজাত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।'[২৫] সাধুরীতির সে মর্যাদা আর নেই। বর্তমানে চলতি রীতিই আভিজাত্য ভোগ করছে। ফলে হাই ভ্যারাইটি/লো ভ্যারাইটি বিভাজন বাংলায় ঠিক প্রয়োজ্য নয়।

## উদ্ভব ও স্থায়িত্বের প্রশ্ন

আরবি ভাষায় ডায়গ্লসিয়া-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে ইসলামের জন্ম তথা পবিত্র কোরআনের পর থেকেই। গ্রীক ডায়গ্লসিয়ার উৎপত্তির মূল বহু শতাব্দী আগে নিহিত থাকলেও উনিশ শতকের গোড়াতে গ্রীক সাহিত্যের পুনর্জাগরণ এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের আদলে সাহিত্যিক-ভাষা নির্মাণ-প্রচেষ্টা থেকে দ্বি-রীতি-পরিস্থিতি বিকশিত হতে শুরু করে।[২৬]

পৃথিবীর কোন দেশেই ডায়গ্লসিয়া-পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয়। আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে ইসলাম ও কোরআন যতদিন থাকবে তত দিন হয়তো ডায়গ্লসিয়া-পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। বাংলায়ও সাধুরীতির বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠেছে। কিন্তু সাধুরীতির বহু শব্দ চলতি রীতিতে ঠাঁই করে নিয়েছে অনেকের অগোচরে। জোর করে তৎসম শব্দ বর্জনের প্রচেষ্টা গৃহীত হলে প্রশ্ন উঠবে ভাষা-শৈথিল্যের। চলতি রীতির গদ্যকে এলিয়ে-যাওয়ার হাত-থেকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সাধু-ঘেঁষা শব্দাবলী।

## তথ্যনির্দেশ

১ '...Where two varieties of a language exist side by side throughout the community, with each having a definite role to play.'— Charles Ferguson, 'Diglossia' in *Language and social context (Giglioli'*, P. edited), Penguin books, 1985 p. 232,

২ ফার্গুসন, পূর্বোক্ত

৩ Muriel Saville-Troike-এর *'The Ethnography of communication* গ্রন্থে উদ্ধৃত, Basil Blackwell, Oxford, 1982, পৃষ্ঠা: ৫৭

৪ পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

৫ ফার্গুসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

৬ পিটার ট্রাজিল, *সোসিও লিঙ্গুইস্টিক্স: এ্যান ইনট্রুডাকশন,* পেঙ্গুইনবুকস, ১৯৭৫, পৃ. ১২০

৭ ফার্গুসন, পূর্বোক্ত

৮ পিটার ট্রাজিল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৯ ট্রাজিল, পূর্বোক্ত

১০ ট্রাজিল, পূর্বোক্ত

১১ ফার্গুসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩

১২ আর. এ. হাডসন, *সোসিওলিঙ্গুইস্টিক্স,* ক্যামব্রিজ, ১৯৮৬, পৃ. ৫৬-৫৭

১৩ স্যাভিল-ট্রোইক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১৪ মৃণাল নাথ, *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা,* বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ১৯৮৯, পৃ.৩৫

১৫ মনসুর মুসার 'ভাষা-পরিকল্পনা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত, *বাঙলা ভাষা,* হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৪৩৯

১৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত *বাঙলা ভাষা,* বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৬৩

১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চলতি ও সাধু ভাষা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, *বাঙলা ভাষা,* পৃ. ৪০৬

১৮ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আমাদের ভাষা সমস্যা,* পৃ. ১২

১৯ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষাপ্রকাশ-বাংলা ব্যকরণ,* কলিকাতা ১৯৪৫, পৃ. ৫

২০ রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা* ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৮৮, পৃ. ৬৬৬

২১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গালা ভাষা', হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত *বাঙলা ভাষা,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮

২২ বীমস, মনসুর মুসার 'ভাষা-পরিকল্পনা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

২৩ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.৭

২৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫

২৫ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

২৬ ফার্গুসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩-৩৪